ভূমিকা (Proposition)

সাহিত্যের আধুনিক রূপ উপন্যাস যা বাস্তবমুখী ও জীবনমুখী। মানুষ জীবনের ব্যথা বেদনা, সুখ আনন্দ, তৃপ্তি অতৃপ্তি, আশা-নিরাশা, প্রেম সবকিছুর জীবন্ত প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই উপন্যাসে। মানব জীবনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক জন্ম ও মৃত্যু। জন্মের পর থেকে শুরু হয় প্রাণী মাত্রেরই জীবনলীলা যার যবনিকাপাত হয় মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। বিভিন্ন ঔপন্যাসিকের হাতে মানব জীবনের লীলা রঙ্গ রসে দু:খে সুখে এক নতুন রূপ লাভ করেছে। নর-নারীর জীবনের সমস্যাকে কোন বিশেষ রূপ দেবার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নিয়মেই আসে মৃত্যু। কারণ মৃত্যুর মধ্য দিয়েই কখন সৃষ্টি নতুন উপন্যাসের কাহিনীর ধারা, কখন মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে বেদনাময় কাহিনীর পরিসমাপ্তি। একেক সময় মৃত্যুকে উপন্যাসিকরা ব্যবহার করেছেন একেকভাবে। তাঁদের দৃষ্টিতে মৃত্যুর আলাদা রূপ আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। কখন মৃত্যু মনে হয়েছে স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে, কখন অতি ভয়ঙ্কর। এক্ষেত্রে দুজন উপন্যাসিকের দৃষ্টিতে মৃত্যু কেমন, কিভাবে দেখেছেন, কাহিনীতে উপস্থাপন করেছেন সেই বিষয়েই আলোচনা করা এই গবেষণা গ্রন্থের মূল লক্ষ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বিধৃত মৃত্যুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের মৃত্যুর তুলনামূলক আলোচনাই এখানে উল্লেখযোগ্য। বাংলা উপন্যাসের অন্যতম উপাদান যে মৃত্যু এবং বাংলা কথাসাহিত্যিকের লেখককে আশ্রয় করে বাংলা উপন্যাসের মৃত্যুর রূপটি তুলে ধরবার পূর্বে ভারতীয় এবং য়ুরোপীয় চিন্তা ধারায় ও সাহিত্যে মৃত্যুকে কিভাবে দেখা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়।

বাস্তবিক পক্ষে প্রাচীনতম কাল থেকেই জন্ম ও মৃত্যু মানুষকে সমানভাবে নাড়া দিয়েছে। একটা সময় ছিল যখন মানুষ তার জন্মকে ঈশ্বরের দান এবং মৃত্যুকে ঈশ্বরের ডাক বলে মেনে নিয়েছে। ঈশ্বরের সন্তান মানুষ, তাই ঈশ্বর প্রয়োজনে তাদের কাছে ডেকে নেন অর্থাৎ প্রাচীনকালে মানুষের বিশ্বাস ছিল জন্ম এবং মৃত্যু নিয়ে দুই-ই ঈশ্বরের ইচ্ছের উপর নির্ভর করছে। ঈশ্বরের লীলা বলেই প্রাচীনকালের মনে করছেন জন্ম ও মৃত্যুকে। আমরা পর্যালোচনা করে দেখতে পাই জন্ম ও মৃত্যু নিয়ে মানুষের মনে একটা স্থির বিশ্বাস গড়ে উঠেছে, তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী জন্ম ও মৃত্যুর ক্ষেত্রে মানুষের কোন হাত নেই, এর পিছনে এক অদৃশ্য শক্তির বিধানই কাজ করছে – আর এই অদৃশ্য শক্তিই হল ঈশ্বর বা সর্ব শক্তিময় ভগবান।

ভারতীয় পুরাণে মৃত্যু সম্পর্কে এক চিত্তাকর্ষক 'মিথ' বা গল্প প্রচলিত আছে। ঈশ্বর স্বর্গে একদিন যখন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তখন মর্ত্যলোক থেকে ভেসে আসা কোলাহলে তার বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটে – তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে যমরাজকে ডেকে পৃথিবী থেকে ভেসে আসা কোলাহলের কারণ অনুসন্ধান করতে বলেন। যমরাজ তথাস্তু বলে পৃথিবীর উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে ঈশ্বরের কাছে ফিরে এসে কোলাহলের কারণ বিবৃত করেন। তিনি জানালেন যে লোকসংখ্যার মাত্রা পৃথিবীতে এতই বেড়ে গেছে যে সেখানে ক্রমে স্থানাভাব দেখা দিচ্ছে ফলে মর্ত্যে মানুষের এই কোলাহল সৃষ্টি হয়েছে। এই কথা শুনে ঈশ্বর সমস্যা সমাধানের জন্য এক নারীমূর্তি সৃষ্টি করলেন। সেই নারী ঈশ্বরকে প্রণাম জানাতে চাইলেন। ঈশ্বর তাকে নির্দেশ দিলেন মর্ত্যে গিয়ে লোকসংখ্যা কমিয়ে দেওয়াই তার প্রধান কাজ হবে। তখনই নারী রূপিণী মৃত্যু

প্রভুর নিকট আবেদন জানায় সে নারী হয়ে এমন নির্মম আদেশ কিভাবে পালন করবে। সে নারী হয়ে মায়ের কোল থেকে সন্তান আর স্ত্রীর কাছ থেকে তার স্বামীকে ছিনিয়ে আনবে। প্রিয়জনের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে আপনজনদের কি ভাবেই বা সে চোখের জলে ভাসাবে। সুতরাং ঈশ্বর যেন তার নির্মম আদেশ ফিরিয়ে নেন। ঈশ্বর নারী রূপিণী মৃত্যুর কথায় বিচলিত না হয়ে সেই নারী রূপিণী মৃত্যুকে দৃষ্টিহীন চেতনাহীন, অনুভূতিহীন করে দিলেন। এরপর থেকেই ঈশ্বরের আদেশে অন্ধ, অনুভূতিহীন, চেতনাহীন নারী রূপিণী পৃথিবীতে নেমে আসে আর শুরু হয় মৃত্যুর পালা। তারাশঙ্কর তাঁর আরোগ্যনিকেতন উপন্যাসে মৃত্যু সম্পর্কে এই পৌরাণিক কাহিনীটি ব্যবহার করেছেন, একথা প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়।

মৃত্যু সম্বন্ধে এই পৌরাণিক কাহিনী নিছক গল্প ছাড়া হয়ত কিছুই নয় কিন্তু এই 'মিথ' বা গল্প থেকে মৃত্যু সম্পর্কে ভারতের প্রাচীন ধারণাটি আমরা সহজেই অনুভব করতে পারি। ধারণাটি হল এই যে মৃত্যু সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের অভিপ্রায় বা অন্যভাবে বলা যায় – ঈশ্বরের লীলা। এই চিন্তাধারা ভারতীয় জনমানসে মৃত্যুকে অনেকটা সহনশীল করে তুলেছে। এই ধারণার অন্তরালে সন্নিহিত আছে একটি অর্থ তা হ'ল এই যে, মৃত্যু যতই নির্মম হোক না কেন, মৃত্যুর পিছনেই ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ বা করুণা বা ইচ্ছা নিহিত আছে। কাজেই মৃত্যু মানুষের পক্ষে ভয়ঙ্কর কিছু নয়।

সম্ভবত উপরোক্ত পৌরাণিক কাহিনী সূত্র ধরেই জন্মান্তরবাদের উদ্ভব হয়েছে। হিন্দু দর্শনে, যেমন গীতায় বলা হয়েছে – জীবের দেহটা হচ্ছে একখন্ড বস্ত্র বা খাঁচার মত। আমরা যেমন জীর্ণ বস্ত্র খুলে নতুন বস্ত্র পরিধান করি অথবা

খাঁচা জীর্ণ হয়ে গেলে যেমন তার ভিতর থেকে পাখী উড়ে পালায়, তেমনি করে আমাদের দেহ যখন জীর্ণ হয়ে আসে তখন দেহস্থিত আত্মা নতুন দেহ ধারণের জন্য সেই জীর্ণ দেহখানি পরিত্যাগ করে। বস্তুত, যাকে আমরা মৃত্যু বলি প্রকৃতপক্ষে তার প্রয়োজন জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করা মাত্র পুনরায় নবদেহ ধারণের জন্য। হিন্দু দর্শন অনুসারে আত্মা অবিনশ্বর, আত্মার মৃত্যু নেই। প্রাণীমাত্র এক দেহ ছেড়ে অন্য দেহ ধারণ করে, আত্মা অমর, মৃত্যু হল এক জন্ম থেকে আর জন্ম নেওয়ার পদ্ধতি মাত্র। এই জন্মান্তরবাদের ধারণা হিন্দু দর্শনে বা ভারতবর্ষে মৃত্যুকে সহনশীল ও অর্থপূর্ণ করে তুলেছে । হিন্দু দর্শনের মত বৌদ্ধ দর্শনেও জন্মান্তরবাদকে স্বীকার করে নিয়েছে। বৌদ্ধ জাতক কাহিনী তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বুদ্ধদেবের বিভিন্ন জন্মের কহিনী জাতকের গল্পে উল্লেখিত হয়েছে। মৃত্যুকে ভয়ঙ্কর রূপে না দেখে সহনশীল মানসিকতার মধ্যে দিয়ে গ্রহণ করার প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বুদ্ধদেবের একটি অতি প্রচলিত কাহিনীর উল্লেখ করা যেতে পারে। সদ্য পুত্র হারা এক রমণী বুদ্ধদেবের কাছে গিয়ে তাঁর মৃত সন্তানের প্রাণ ফিরিয়ে দেবার ব্যাকুল প্রার্থনা জানায় । বুদ্ধদেব সেই সদ্য সন্তান হারা মাতাকে শান্ত কণ্ঠে বলেন যে এমন কোন পরিবার থেকে তাকে শস্যদানা সংগ্রহ করে আনতে হবে যেখান মৃত্যু প্রবেশ করেনি। সেই নারী এমন কোন বাড়ী বা পরিবার খুঁজে পায়নি যেখানে কেউ মারা যায়নি বা শোক প্রবেশ করেনি। ব্যর্থ হয়ে সেই নারী বুদ্ধদেবের পায়ে লুটিয়ে পড়েন। তাঁর চোখ থেকে মায়ার বন্ধন খসে পড়ে, বুদ্ধের পায়ে সে মিনতি জানায়। সে সন্তানের প্রাণ ভিক্ষা চায় না, অমৃতে দীক্ষা লাভ করতে চায়। এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে করুণা দ্বারা আবৃত মৃত্যুর ঘন রূপটি ফুটে

উঠেছে। মৃত্যু প্রত্যেকের জীবনেই অনিবার্য। মৃত্যু জীবনের নাশ নয় রূপান্তর মাত্র। মৃত্যুর তাৎপর্য হলো নব জন্ম বা ঈশ্বর প্রাপ্তিতে। তাকেই বৌদ্ধ দর্শনে মহানির্বান বা মুক্তি বলা হয়েছে। অদ্বৈত বেদান্ত বলেছে জগৎ মিথ্যে, ব্রহ্ম সত্য। শংকরাচার্য বলেছেন – এই জগতের যা কিছু আমরা দেখি সবই মায়া, এক মাত্র সত্য হচ্ছে ঈশ্বর বা পরম ব্রহ্ম। মানুষ জন্মের পর স্বাভাবিক ভাবেই সাংসারিক মোহজালে আবদ্ধ হয়। সংসারের গড়ে ওঠা সব সম্পর্কই মোহ ছাড়া কিছুই না, নিছক মায়াজালে আবদ্ধ হওয়া। মৃত্যু দ্বারাই মানুষ এই মায়াজাল থেকে মুক্তিলাভ করে। মোহজাল হতে ছিন্ন হয়ে মানুষ মৃত্যুর পর ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে পারে। সেই সান্নিধ্য লাভই একমাত্র সত্য। এক্ষেত্রে মোক্ষ লাভ করতে হলে মৃত্যু বরণ করতেই হবে। একমাত্র মৃত্যুর দ্বারাই সাধারণ মানুষ সংসারের বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের ক্ষেত্রে একধাপ এগিয়ে যায়। এমনভাবে গ্রহণ করলে মৃত্যু পীড়াদায়ক বা ভয়ানক মনে হয় না।

উপনিষদ বলে – 'আনন্দম্ রূপম্ অমৃতম্ যদ্ বিভাতি' অর্থাৎ উপনিষদ – উল্লিখিত মত অনুযায়ী আমরা যা কিছু দেখছি সবই আনন্দের অমৃত রূপ। আনন্দের মধ্যেই সব কিছুর জন্ম। আনন্দের মধ্যেই বেঁচে থাকা এবং আনন্দের মধ্যেই প্রয়াণ বা সমাপ্তি। অর্থাৎ উপনিষদের ভাষায় সব কিছুর মূলেই নিহিত আছে আনন্দ। সুতরাং উপনিষদের জন্ম ও মৃত্যু উভয়েই আনন্দের মধ্যে হয়। উপনিষদে আরো বলা হয়েছে 'আনন্দাদ্ধেব যন্বিসানি ভূতানি জায়ন্তে / আনন্দেন জাতানি জীবন্তি / আনন্দম্ অবিষম বিষন্তি প্রয়ান্তি ইতি।' এই তত্ত্বানুসারে মানুষের জন্মের মূলে আছে আনন্দ, বেঁচে থাকার মধ্যে আছে আনন্দ, এমনকি প্রয়াণ বা মৃত্যুর মধ্যেও আনন্দ। এইভাবেই উপনিষদে

মানুষের জন্ম এবং তার মধ্যে পরম ব্রহ্মার অস্তিত্ব নিহিত আছে। উপরোক্ত আলোচনার সূত্র ধরে বলা যেতে পারে যে ভারতবর্ষ মৃত্যু সম্পর্কে যে বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছে তার ভিতর দিয়ে ভারতীয় দর্শনের একটি মৌলিক সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করা হয়েছে। ভারতবর্ষ মানুষের জীবনের অস্তিত্ব ও মূল্য স্বীকার করেও তার উপরে স্থান দিয়েছে এক ঐশ্বরিক লীলাকে। ভারতবর্ষের ধারণা এই যে আমাদের বস্তুময় জগৎ তার বাইরে আছে এক অদৃশ্য জগৎ – এই যে পার্থিব জীবন তা হচ্ছে অনিত্য এবং সেই অদৃশ্য জগৎ হচ্ছে নিত্য। মানুষ মৃত্যুর ভিতর দিয়ে তাই অনিত্য লোক থেকে নিত্য লোকে যাত্রা করে তাই মৃত্যুলোক অশুভ হতে পারে না। মৃত্যু আমাদের কাছে যতই মর্মান্তিক বিচ্ছেদের অসহ্য বেদনা বহন করে আনুক না কেন তাকে শান্তভাবে ঈশ্বরের অনুগ্রহ বলে গ্রহণ করা উচিত। গীতায় আছে অর্জুন যখন তাঁর প্রিয় পুত্র অভিমন্যুর মৃত্যু সংবাদ শুনলেন, তখন যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়লেন। সেই মুহূর্তে কৃষ্ণ তাঁকে বোঝালেন যে অভিমন্যুর মৃত্যু ঘটেনি, সে লোকান্তরে গেছে মাত্র। বিশ্বরূপ দর্শনের ভিতর দিয়েও কৃষ্ণ অর্জুনকে দেখিয়েছিলেন যে মৃত্যু কোন কিছুই মানুষের ইচ্ছাধীন নয়। সবই পূর্বনির্ধারিত। মৃত্যু সম্পর্কে ভারতবর্ষের ধারণার মূল কথা মৃত্যু বিচ্ছেদমাত্র নয়, বরং মৃত্যুর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অত্যন্ত শুভময়। ভারতীয় চিন্তাধারায় মৃত্যুর প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন ভারতীয় সাহিত্যে স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। যথার্থভাবে বলতে গেলে মৃত্যুর সম্পর্কে একটা সাধারণ ভীতি থাকলেও জন্মান্তরবাদের প্রতি আস্থাশীল হওয়ায় ভারতীয় হিন্দু সমাজ মৃত্যুকে বহুল পরিমাণে সহজভাবে গ্রহণ করতে পেরেছে। মৃত্যু জীবনের অমোঘ ও অবশ্যম্ভাবী পরিণতি জেনেও পরজন্মের

সম্ভাব্য আলোকোজ্জ্বল জীবনের ছবি কল্পনা করে আমরা, ভারতবর্ষের মানুষ মৃত্যুজনিত বিচ্ছেদ যন্ত্রণার দাহ অনেক পরিমাণে প্রশমিত করে নিয়ে থাকি। মৃত্যু মানেই বিচ্ছেদ, আপনজন থেকে পৃথিবীর সব কিছু থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। তবুও ভারতীয় ধারণায় মৃত্যু শেষ হয়ে যাওয়া নয়। মৃত্যুর পর প্রাণী মাত্রই ইহলোক ছেড়ে পরলোক গমন করে অর্থাৎ লোকান্তর ঘটে মাত্র। তাই ভারতীয়দের কাছে মৃত্যু অতি ভয়ানক ব্যাপার নয়, যদিও চিরকালের মত বিচ্ছেদ, নীরব ও স্থির হয়ে যাওয়ার যে বাস্তব কঠিনতা, সেই সম্পর্কেও তারা উদাসীন নয়। রামমোহনের মত মানুষ যিনি ব্রাহ্মধর্মের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন তাঁকে বলতে শোনা গেছে – 'মনে রেখো শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর / সবাই বাক্য কবে, তুমি রবে নিরুত্তর।'

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের দিকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই সেখানে মৃত্যুর প্রসঙ্গ এসেছে, কিন্তু সে মৃত্যু যেন জীবনের আর পাঁচটা ঘটনার মত একটা স্বাভাবিক পরিণতি রূপে দেখা দিয়েছে। সংস্কৃত নাটকে স্পষ্টত মঞ্চের উপর কোন কোন মৃত্যু দৃশ্য ক্বচিৎ দেখা যায়। মঞ্চের উপর হত্যার দৃশ্য প্রাচীন ভারতীয় নাটকে প্রায় অনুপস্থিত বলা চলে। রামায়ণ মহাভারতের মত মহাকাব্যে যুদ্ধক্ষেত্রে যে সব মৃত্যুর দৃশ্য অঙ্কিত আছে সেসব দৃশ্যে ভীষণতার ছাপ তেমন স্থান পায়নি। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে মৃত্যুর যেসব দৃশ্য চিত্রিত আছে তাদের সম্পর্কেও একই কথা বলা যেতে পারে। মধ্যযুগের কাব্যধারায় মৃত্যুর পর স্বর্গগমনের বর্ণনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে পাপের পরিণতি হিসেবে মৃত্যু ঘটানো হয়েছে। সুতরাং প্রাচীন কবিরা যে মৃত্যুর বিষয়ে বেশ খানিকটা সহনশীলতার পরিচয় রেখে গেছেন, তা বলা যেতে

পারে। ফলে, ঐতিহ্য পরম্পরায় মৃত্যু সম্পর্কে এই বোধ প্রাচীনকাল থেকেই প্রবাহিত হয়ে এসেছে।

অন্যদিকে ইউরোপীয় ধ্যান ধারণায় বা সাহিত্যে মৃত্যুকে সম্পূর্ণ বিপরীত রূপে আমরা দেখতে পাই। ঠিকমত বলতে গেলে, ভারতীয় ধ্যান ধারণায় ও সাহিত্যে মৃত্যুর যে চিত্র ফুটে উঠেছে ইউরোপীয়দের মৃত্যু সম্পর্কে বিপরীত ধরনের চিত্র ও বোধ তাদের রচিত সাহিত্য কলার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। মৃত্যুকে ইউরোপ কিভাবে দেখেছেন বা মৃত্যু সম্পর্কে ইউরোপে যে ধারণা গড়ে উঠেছে তার স্পষ্ট একটি ছবি আমরা গ্রীক ট্র্যাজেডির মধ্যে দেখতে পাই। মৃত্যুর কথা বলতে গিয়ে অ্যারিষ্টটল যে 'নেমেসিস' বা নিয়তির কথা বলেছেন, তার একটা স্পষ্ট রূপ গ্রীক ট্র্যাজেডির মধ্যে বিধৃত হয়েছে। সফোক্লিস এবং এস্কাইলাসের ট্র্যাজেডিগুলিতে দেখতে পাই যে একটা প্রচন্ড নির্মম মৃত্যুর মধ্যে তার পরিণতি ঘটেছে। এর ভিতর দিয়ে যে গ্রীক জীবনাদর্শ ফুটে উঠেছে তার মূল কথা হল এইযে মানুষ মূলত নিয়তির হাতের পুতুলমাত্র এবং এই নিয়তি মানুষকে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে তিল তিল করে এগিয়ে নিয়ে যায়, যেন একটি কঠিন নির্মম মৃত্যু বরণ করা ছাড়া জীবনের আর কিছুই সত্য নয়। গ্রীকরা ছিল সৌন্দর্য্যের পূজারী। সেই সৌন্দর্য কোন কল্পিত বস্তু নয়। তারা সেই সৌন্দর্যকে মানুষের জীবনের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছে এবং প্রাচীন গ্রীকরা মানুষের চোখ দিয়েই জীবনকে দেখেছে মানুষের জীবনই তাই তাদের কাছে সবচেয়ে বড় সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আসলে গ্রীক সংস্কৃতির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে এই পৃথিবীকে ও মানব – জীবনকে তাদের মত করে কেউই এত ভালবাসেনি। তাই তাদের কাছে মৃত্যু হয়ে উঠেছে ভয়ানক। তাই

গ্রীক কবি সাফো বলেছেন "Death is evil" । ভারতীয়দের মত কোন আবরণে ঢেকে মৃত্যকে তারা সহনশীল করতে চায়নি। তারা জানতো কোন কিছু দিয়েই একজন মানুষের মৃত্যুর দাহ বা যন্ত্রণাকে প্রতিহত বা প্রশমিত করা যায় না, কারণ মৃত্যু শুধু চির বিচ্ছেদ নয়, তা হচ্ছে একজন মানুষের জীবনের নিশ্চিত অবসান। সম্ভবত গ্রীক ট্রাজেডির উপরোক্ত মৃত্যু ভাবনার অনুসরণে শেক্সপিয়রের ট্রাজেডিতে মৃত্যু দৃশ্য গুলি গড়ে উঠেছে। শেক্সপিয়র তাঁর ট্রাজেডির ক্ষেত্রে স্পষ্টত নিয়তির কথা বলেননি, কিন্তু শেক্সপিয়র গ্রীকদের মতই মৃত্যুর ভয়ঙ্কর রূপটি তুলে ধরেছেন। ম্যাকবেথ, ওথেলো, হ্যামলেট প্রভৃতি চরিত্রগুলি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

ভারতীয় এবং য়ুরোপীয় চিন্তাধারায় ও সাহিত্যে মৃত্যুকে কিভাবে দেখা হয়েছে তার যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল সেদিকে লক্ষ্য রাখলে সহজেই বোঝা যাবে যে প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় ও য়ুরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে মৌলিক একটা পার্থক্য রয়েছে। মৃত্যু যে জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি কোনমতেই তা কারো পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, এই সহজ সত্য মেনে নিয়েও ভারতবর্ষ ও য়ুরোপ ভিন্নরূপে মৃত্যুর মূল্যায়ণ করেছে। য়ুরোপ প্রথম থেকেই মৃত্যুকে Evil বলে জেনে এসেছে; তাই য়ুরোপ কখনো তাকে ভারতীয়দের মতো করে সহনশীল করে নেয়নি বা তার ভীষনতাকে কোন আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখেনি। সমগ্র য়ুরোপীয় সাহিত্যে তার ছাপ স্পষ্ট। মানবজীবনকে প্রাধান্য দিয়ে এসেছে তার পরজন্মের কল্পনা না করে আর এই কারণেই ভারতীয় ও য়ুরোপীয় সাহিত্যে মৃত্যুর রূপটি প্রায় সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে প্রতিফলিত হতে দেখি।

বস্তুত, আধুনিক পূর্ব বাংলা সাহিত্যে যে সব মৃত্যুর বর্ণনা আছে, যদিও তা নিতান্তই বিরল, তা যে মূলত পূর্বালোচিত ভারতীয় মৃত্যু ভাবনার ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে, তা বোধ হয় ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখেনা। কিন্তু আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে যে পালাবদল ঘটল তার ফলে আমরা রাতারাতি একদিকে যেমন বৃহত্তর য়ুরোপীয় সাহিত্যের স্বাদ পেলাম, অন্যদিকে তেমনি আমাদের পল্লীকেন্দ্রিক সাহিত্যের ধ্যানধারণা বদলে যেতেও দেখলাম। প্রকৃতপক্ষে, গদ্যাশ্রিত যে আধুনিক বাংলা সাহিত্য তার উদ্ভব হয়েছে য়ুরোপীয় সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলেই। স্বভাবতই সেই কারণেই বাংলা উপন্যাসের সূচনা থেকেই জীবন সম্পর্কে আমাদের ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে বাংলা সাহিত্যে।

যেহেতু সাহিত্যের অঙ্গনে উপন্যাসের আবির্ভাব বেশী দিন ঘটেনি, সুতরাং প্রারম্ভে আলোচনার প্রয়োজনে প্রসঙ্গক্রমে মৃত্যু সম্বলিত প্রাচীন কিছু নাটকের উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। প্রাচীন সাহিত্যেও মৃত্যু উপাদানটির এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। বিদেশী উপন্যাসে ও নাটকে ট্র্যাজেডি রচনার ক্ষেত্রে মৃত্যুর ছিল এক বিশেষ ভূমিকা। নাটকে, উপন্যাসে ট্র্যাজেডি ঘটতো একটা-না-একটা মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। ইলিয়ড পাশ্চাত্য ট্র্যাজেডির এক প্রাচীনতম উদাহরণ বলা যেতে পারে। ইলিয়ড ট্র্যাজেডি গ্রীক সাহিত্যে এক সুগভীর সত্যকে উপস্থাপিত করেছিল। বিশ্ব সংসারের প্রবল পরাক্রান্ত শক্তির কাছে মানুষ নিমিত্ত মাত্র। ঐ শক্তির প্ররোচনায় মানুষ তার সংযম ঔচিত্যবোধ বা সাংসারিক জ্ঞানবুদ্ধি হারিয়ে সর্বনাশের পথে নেমে যায়, কখন অপরের সর্বনাশ করতে গিয়ে টেনে আনে নিজের জন্য চরম সর্বনাশ। শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর মধ্যে

দিয়ে ঘটেছে অনিবার্য পরিসমাপ্তি। ঈসকাইলাস, সফোক্লিস এবং ইউরিপিডিস নাটকের ও তাদের করুণাকাতর সুর ধ্বনিত হতে শোনা গিয়েছে। মানুষের ব্যথায় কেঁদে উঠেছে তাঁদের প্রাণ। ইংরেজি সাহিত্যে ট্র্যাজেডির প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। চতুর্দশ শতাব্দী থেকেই। তবে ট্র্যাজেডিতে একমাত্র মৃত্যুর আবির্ভাব ঘটে তা নয়। রোমান্টিক ট্র্যাজেডি ছাড়াও কমেডিতেও মৃত্যু আছে বিভিন্ন চরিত্রের করুণ রস নিস্পত্তির বিশেষ সহায়ক। যেমন শেক্সপিয়রের ট্র্যাজেডিতে নায়কের মৃত্যু ঘটবেই। অপরিসীম দু:খ দুর্দশার মধ্য দিয়ে এই মৃত্যু এসে নায়ককে গ্রাস করে সমগ্র পরিবেশ শোকাকুল করে তোলে। সুবিখ্যাত শেক্সপীয়রের সমালোচক ব্যাডলি শেক্সপীয়রের লেখা ট্র্যাজেডি সম্বন্ধে বলেছেন যে একজন মানুষ স্বকৃতকর্মের ফলস্বরূপ অস্বাভাবিক দু;খ কষ্ট ভোগ করেন এবং পরিণামে মৃত্যু মুখে পতিত হন। এখানে এই যে মানুষের অস্বাভাবিক দু;খ কষ্ট ভোগ করার কথা বলা হয়েছে, এইটিই ট্র্যাজেডির আবর্তে নিপতিত মানুষের প্রতি আমাদের সহানুভূতিসম্পন্ন করে তোলে এবং আমরা শোকার্ত হই।[১] শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডিতে অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত মানুষের দু:খ দুর্দশা আমাদের শোকার্ত করে তোলে। অন্যদিকে গ্রীক ট্র্যাজেডির দৈব বা নিয়তির হাত ধরেই যেন আসে মৃত্যু। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে বিষাদান্তক পরিণতিকে তেমন প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ১৮৫২-তে লেখা যোগেশ চন্দ্র গুপ্তের কীর্তি বিলাসই ট্র্যাজেডি রচনার প্রথম প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে। এর কয়েক বছর পরই উমেশ চন্দ্র মিত্রের বিধবা বিবাহ ১৮৫৬ সালে নাটকটি প্রকাশিত হয়। বিধবা সুলোচনা অবৈধ সন্তান গর্ভে ধারণ করে। একদিকে সম্ভাবনাময় মাতৃত্ব, অন্যদিকে

ধর্মভয়, নারীলজ্জা, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনের তিরস্কার, ভবিষ্যৎ জীবনের ভয়াবহতা ও অনিশ্চয়তা স্মরণ করে মৃত্যুর পথকে বেছে নেয়। শেষ মুহূর্তে মৃত্যুই তার কাছে শ্রেয় মনে হয় - যেমন 'শ্রান্ত যুক্ত পথিক তৃষ্ণায় কাতর হইয়া নিকটবর্তী বৃক্ষছায়া দেখিলে সন্তুষ্ট হয়, মৃত্যু আমার তদ্রুপ বোধ হইতেছে।' বিধবা বিবাহ আইন পাশ হওয়ার পরও সমাজের হৃদয়হীনতার এই প্রাণময় জীবন অকালে ঝরে গিয়েছে। হরচন্দ্র ঘোষের 'কৌরব বিয়োগ' (১৮৫৮) নাটকটি উল্লেখ করা প্রয়োজন। দুর্যোধন উরুভঙ্গ অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে আছেন। শোকাবহ ভীতিপ্রদ পরিবেশ। অশ্বত্থামা পঞ্চপান্ডবকে বিনাশের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেনাপতির পদ গ্রহণ করেন। পঞ্চপান্ডবের পঞ্চপুত্রকে নিহত করে ছিন্নমুন্ড মুমূর্ষু দুর্যোধনকে প্রদর্শন করালেন। 'হর্ষ বিষাদে' মৃত্যু ঘটে দুর্যোধনের। চারিদিকে বিলাপ ও শোকের পরিবেশ কুরুবধূগণ নিজ নিজ স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় সতীব্রত পালন করে। এরপর আর একটি শোকবহ মৃত্যু ভীষ্মের আত্মত্যাগ।

দীনবন্ধু মিত্র নীলদর্পন (১৮৬০) নামে ট্র্যাজেডি রচনা করেছিলেন নীলদর্পনের মৃত্যু দৃশ্যগুলি পরবর্তীকালের নাট্যকারদের অনুপ্রাণিত করেছিল। মধুসূদনের 'মায়াকানন' ট্র্যাজেডি হিসাবে উল্লেখযোগ্য। দৈব নিপীড়নের কাছে মানুষের পরাভবের অভিজ্ঞতারই প্রকাশ ঘটেছে এক্ষেত্রে।

বাংলা সাহিত্যে ট্র্যাজেডি নাটকেই দেখা দেয়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের পূর্বে উপন্যাসে ট্র্যাজেডির প্রকাশ ঘটেনি। ট্র্যাজেডি রচনার ক্ষেত্রে বাঙালী নাটকের তুলনায় উপন্যাসই সাফল্য লাভ করে। তার কারণ নাটক আমরা প্রত্যক্ষে দেখি কিন্তু উপন্যাসে কল্পনায় দেখি। বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুন্ডলা,

বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর মৃণালিনী, কৃষ্ণকান্তের উইল ইত্যাদি উপন্যাসগুলির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

বঙ্কিম উপন্যাসে মৃত্যু ঘটেছে, ট্র্যাজেডি তৈরী হয়েছে। তাঁর রচনায় ট্র্যাজেডির ভিন্নতর রস ও শিল্প গরিমার প্রকাশ ঘটেছে। শেক্সপিয়রের প্রভাব তাঁর উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায়। নিয়তির হাতের পুতুল হয়েই যেন উপন্যাসের বিশেষ বিশেষ চরিত্রগুলি ট্র্যাজেডির দিকে এগিয়ে গেছে। বঙ্কিম উপন্যাসে নারী চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা যায় না বললেই চলে। তাঁর উপন্যাসে মানুষের চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে উপাদান হিসেবে নিয়তিশক্তির ক্রূর লীলায় মৃত্যু এসেছে। ধীরে ধীরে চরিত্রগুলি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে এসেছে। মৃত্যু সেক্ষেত্রে হয়ে উঠেছে অনিবার্য। গ্রীক ট্র্যাজেডির মধ্যে দেখা গেছে নিয়তি মানুষের ভাগ্য স্থির করেছে। শেক্সপীয়রও নিয়তির বিধানকে অস্বীকার করেননি। নিয়তির পরিহাসেই অদৃষ্টের দোষে ডেসডিমোনা হারিয়েছে রুমাল। সেই রুমাল তার মৃত্যুর একমাত্র কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অদৃষ্টের প্রকোপ হ্যামলেটেও দেখা যায়। ট্র্যাজিক চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই যে শেক্সপীয়রের চিত্রিত চরিত্র যতই গুণবান বা মহৎ হোক না কেন তারা খুব স্বাভাবিক ভাবেই এমন এক ঝোঁক অথবা প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে ভুল করে বসে অথবা অন্যায় করে ফেলে এবং ভুলকে চাপা দিতে সে আরো ভুল করতে থাকে, ফলে ধ্বংসই তার পরিণতি হয়।

আমরা বঙ্কিম উপন্যাসেও এই প্রবৃত্তির সর্বনাশা ভূমিকা লক্ষ্য করে থাকি। কুন্দনন্দিনীর অবৈধ নগেন্দ্র প্রেম বা প্রতাপের শৈবলিনীর প্রতি অবৈধ আকর্ষণ অনুচিত এবং বাস্তবে এই প্রেম চরিতার্থ হওয়া অসম্ভব জেনেও তারা

নিজেদের সতর্ক করতে পারেনি, তাদের পক্ষে আত্মসম্বরণ সম্ভবও হয়নি; ফলে সজ্ঞানেই তারা ট্র্যাজেডির দিকে এগিয়ে গেছে এবং অবশেষে নিজের শেষ মীমাংসা করতে মৃত্যু বরণে বাধ্য হয়েছে।

আবার, কপালকুন্ডলা ও নবকুমারের মৃত্যু ঘটেছে নিয়তির ক্রুর লীলায়। মৃণালিনীতে পশুপতির মৃত্যু ঘটেছিল নিয়তির চক্রান্তে। মনোরমা বিধিলিপির টানেই শেষ পর্যন্ত স্বত:স্ফূর্তভাবে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছিল। পশুপতির উচ্চাভিলাষ তাঁকে অনুচিত পথে পরিচালিত করেছে এবং ভয়াবহ মৃত্যুই পরিণাম হিসেবে পশুপতির উচ্চাকাঙ্খার পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে। অন্যদিকে জ্যোতির্বিদ মনোরমার ভাগ্য গণনা করে বলেছিলেন মনোরমা অল্প বয়সে বিধবা এবং স্বামীর অনুমৃতা হবেন। কিন্তু শত চেষ্টা করেও নিয়তি শক্তির থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি, বিধিলিপিকেই সে অনিবার্য হিসেবে বরণ করে নিয়েছিল। একইভাবে রাজসিংহ উপন্যাসে মোবারক প্রবৃত্তির কাছে অসহায়। তিনি শক্তিহীন ছিলেন না কিন্তু প্রবৃত্তির কাছে হার মেনে ছিলেন। আর সেই দুর্বলতার গ্লানি দূর করতে মৃত্যুকে দন্ড হিসেবে বেছে নেবার মত অসীম সাহস তিনি দেখিয়েছিলেন। মোবারকের ট্র্যাজেডি রচনাতে বঙ্কিমের উপর শেক্সপীয়রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ইংরেজী উপন্যাসের অনুসরণ তাঁর রচনাগুলিতে চোখে পড়ে, যদিও রোমান্টিক উপন্যাস রচনাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। রোমান্সের ফ্রেমেই তিনি তার উপন্যাসের কাহিনীকে বাঁধতে চেয়েছেন। সুকুমার সেনের ভাষায় 'বিশেষত্ব হইল নায়ক-নায়িকার চিত্তে পূর্বরাগের আবির্ভাব, সঞ্চার ও পরিশেষে মিলন (অথবা মৃত্যুতে বিচ্ছেদ)'। বঙ্কিম উপন্যাসে স্কটের প্রভাবও লক্ষণীয়। স্কট অবশ্য তাঁর উপন্যাসে শারীরিক

উপাদানের মধ্যে কাহিনীকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন বলে অ্যাব্‌স্ট্রাক্ট উপাদানটিকে তিনি উপেক্ষা করেছিলেন। এক্ষেত্রে হেনরী জেমস্, তাঁর সুবিখ্যাত "The Art of Fiction" (১৮৮৪) প্রবন্ধটিতে দেখা যায়, উপন্যাসের শিল্পতত্ত্ব সম্পর্কে তিনি তাঁর সামগ্রিক ধারণা প্রকাশ করেছেন। ''জেমস্-এর মতে উপন্যাসের সবচেয়ে বড় ধর্ম হলো বাস্তব জীবনের আবহাওয়াকে সার্থকভাবে গড়ে তোলা। উপন্যাস যেন একটি জীবন্ত সত্তা। সব উপাদান সেখানে অখন্ড এবং নিরবিচ্ছিন্ন ঐক্যে বিধৃত। প্রত্যেকটি অংশের মধ্যে অন্য অংশের কিছু না কিছু বর্তমান। বর্ণনা পদ্ধতি, সংলাপ, চরিত্র, ঘটনা সবকিছুই মিলেমিশে উপন্যাসটিকে প্রাণপূর্ণ করে তোলে।''[২] জেমসের মতে, উপন্যাসকে অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রাণবন্ত করা যায়। উপন্যাসের আলোচনার ক্ষেত্রে তাঁর এই মতামত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জেমস্ মনে করতেন, উপন্যাস বাস্তবসম্মত ও জীবন্ত করে তুলতে কয়েকটি বিষয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। যেমন, তাঁর মতে ''অভিজ্ঞতার মধ্যে পড়ে –

১. দৃষ্টবস্তু থেকে অদৃষ্টপূর্ব বস্তু অনুমান করার ক্ষমতা,

২. বস্তুর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে অনুসন্ধান করার প্রয়াস,

৩. একটি বিশেষ প্যাটার্ন দেখে সমগ্র জিনিষটিকে বিচার করা ও

৪. সাধারণভাবে জীবনকে এমন পূর্ণভাবে অনুভব করা যাতে তার অনুপুঙ্খরূপ নখদর্পণে ধরা যায়।''[৩]

নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে লেখকের জীবনের অভিজ্ঞতার উপর উপন্যাসের ভালো মন্দ নির্ভরশীল। এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে

সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন: এই অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে দুইটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন যে লেখক এখানে কোন দৃষ্টি অবলম্বন করেছেন উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে। প্রথমত জীবনদর্শন, নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে জীবনকে দেখা আর দ্বিতীয়ত জীবন সম্পর্কে একটি বিশেষ ধারণা বা বিশ্বাস মনের মধ্যে গড়ে তোলা যার প্রতিফলন আমরা উপন্যাসে দেখতে পাই। বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে দ্বিতীয় অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছে উপন্যাসে। বঙ্কিম উপন্যাসে জীবন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত চরিত্রগুলি লেখকের বিশেষ ধারণা বা বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। এই আলোচনা থেকে মনে হতে পারে যে জেমস্ উপন্যাসের শিল্পকলায় Idea-র বিশেষ কোন গুরুত্ব দেননি। তবে জেমস্ বলেছেন লেখকের নিজস্ব ভাবধারা সম্বন্ধে সমালোচনা করা যায়না কারণ এক্ষেত্রে লেখক ও পাঠকের রুচি ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু তিনি একথাও স্বীকার করেছেন যে উপন্যাসে লেখকের নিজস্ব জীবন-দর্শনের গুরুত্ব অনেক বেশী। তিনি মনে করেন খাঁটি শিল্পীরা যেন সবচেয়ে সমৃদ্ধ Idea-কেই উপন্যাসে নির্বাচন করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা সংগ্রহ আলোচনাকালে বলেছিলেন যে প্রত্যক্ষ বা বাস্তব নিয়েও সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় তবে এই সৌন্দর্য সৃষ্টির পিছনেও সমাজের প্রতি এবং মানুষের প্রতি কল্যাণেচ্ছা থাকে। সৌন্দর্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গল সাধনের আদর্শ তাঁর লেখায় মূল হয়ে উঠেছে। কথা সাহিত্যিক হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের বিচিত্র দিক তুলে ধরেছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর রচিত কাহিনী ও চরিত্রের অন্তরালে তাঁর সেই আদার্শবাদী সত্তা সক্রিয় থেকে গেছে সব সময়। তাই তাঁর উপন্যাসে সেই বিশিষ্ট আদর্শ বোধ মৃত্যুকেও পরিবৃত করে রেখেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরে রবীন্দ্রনাথ যখন কথা সাহিত্যিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন, ততদিনে বাংলা কথাসাহিত্যে উপন্যাস তখন অনেকটা পরিণতি লাভ করেছে। স্বভাবত:ই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-ধারার একটা স্পষ্ট ছাপ লক্ষ্য করা যায় রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে। জীবনাদর্শ বা সাহিত্যাদর্শের দিক থেকে অবশ্যই বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। কিন্তু একটু গভীরভাবে দেখলেই দেখা যাবে – রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক জীবন ও পারিপর্শ্বিকতার যে প্রভাব ছিল তা তাঁর জীবনাদর্শ ও সাহিত্যাদর্শকে নিশ্চিতভাবে প্রভাবিত করেছে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই বলা যায় যে তাঁর মৃত্যুবোধ বা মৃত্যু সম্বন্ধে ধারণা এই জীবনাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত। অর্থাৎ তাঁর উপন্যাসে মৃত্যুর যে ভূমিকা দেখি তা বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী না হওয়া সত্ত্বেও ভিন্ন এক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিধৃত করা হয়েছে। সাধারণভাবে বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে নাটকে ও গানে মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর ধারণা অকপটে ব্যক্ত করেছেন। সম্ভবত সেই ধারণাই তাঁর উপন্যাসে চিত্রিত মৃত্যুবোধকে প্রভাবিত করেছে। বলাবাহুল্য রবীন্দ্র উপন্যাসে গড়ে ওঠা মৃত্যুর দৃশ্য বা ঘটনাবলীর স্বতন্ত্র রূপ আছে। যা তাঁর জীবন থেকে উঠে এসেছে। একদিকে উপনিষদের প্রভাব, অন্যদিকে শিশুকাল থেকে জীবনের শেষ লগ্ন পর্যন্ত একের পর এক মৃত্যুর বিচিত্র অভিজ্ঞতার ছাপ তাঁর রচনায় সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। তাই সৌন্দর্য পূজারী, জীবন প্রেমী রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে মৃত্যুকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। মৃত্যুর সর্বগ্রাসী রূপ ধ্বংসময় পরিণাম তাঁর হৃদয়ে বেদনার সঞ্চার করেছে। বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে যখন মৃত্যুকে দেখেছেন তখন বেদনা অনুভব করেছেন। জীবনের ভার থেকে মৃত্যু মুক্তি দেয় এই যুক্তিকেও তিনি সহজে মেনে নিতে পারেন নি। মনের কোণে

202089
24 MAR 2003

প্রশ্ন জেগেছে জীবন কি শুধুমাত্র ভার ? ব্যক্তিগত শোকের গভীরতা থেকে, অনুভূতির তীব্রতা থেকে জীবন মৃত্যুর রহস্য উদ্‌ঘাটনের আকুলতা জন্মেছে তার মধ্যে। বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে মৃত্যুকে যতদিন দেখেছেন যন্ত্রণাই অনুভব করেছেন, রহস্যের সমধান খুঁজে পাননি। খন্ড দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে মৃত্যু জীবনের অবসান। জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে যে একটি অভিন্ন সম্বন্ধ আছে এমন বিশ্বাসকে তিনি ধরে রাখতে পারছিলেন না। 'মৃত্যুর পটভূমিকায় জীবনকে মনে হয় শূন্য ও অস্থায়ী বলে; ঈশ্বর, মানুষ ও প্রকৃতিকে মনে হয় উদাসীন ও স্বার্থপর বলে' [৪]

ক্রমে ক্রমে শোক বেদনার আঘাত ও সঞ্চিত অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে তিনি সত্যকে উপলব্ধি করেছেন। নিরপেক্ষ দর্শকের মত এক অখন্ড দৃষ্টি নিয়েই তিনি মহত্তর সত্যকে উপলব্ধি করেছেন। রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি অনুযায়ী কোন মানুষই পৃথকভাবে সত্য নয়, নিখিল মানবের সঙ্গে অখন্ডযোগ প্রতিটি মানুষ সত্য হয়ে ওঠে। কবির মনে হয়েছে সৃষ্টি জুড়ে যে জীবনের প্রবাহটি চলেছে, তার ধ্বংস নেই, ক্ষয় নেই। ব্যক্তি বিশেষের জীবন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ছিন্ন হয়ে যায় সত্য কিন্তু তা লোপ পায় না - জীবনপ্রবাহে অঙ্গীভূত হয় মাত্র। তারপর আবার নূতন জীবনের উদ্ভব ঘটে। এইভাবে জীবনের প্রবাহটি চলেছে বৃত্তের ন্যায় চক্র পরিক্রমায়। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের জীবনে মৃত্যুর এই প্রভাব এবং জীবনের নানান্তরে মৃত্যু সম্বন্ধে গড়ে ওঠা সম্যক বোধ ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব স্পষ্টতই লক্ষ্য করা যায় তাঁর রচনার মধ্যে। আর এদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা রবীন্দ্র উপন্যাসে বিধৃত মৃত্যুর স্বরূপ নির্ণয় করতে চেষ্টা করব।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই গবেষণা মূলত বিষয়বস্তু কেন্দ্রিক (Thematic) এবং সেই বিষয়বস্তু হল উপন্যাসে বিধৃত মৃত্যুর অবস্থান ও মূল্যায়ন। জীবন ও মৃত্যু মিশিয়েই জীবনের কাহিনী বা ঘটনাপুঞ্জ রচিত হয়। উপন্যাসে তাই জীবনের পাশাপাশি মৃত্যুও স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে। কিন্তু শুধুমাত্র মৃত্যুকে বিষয়বস্তু হিসেবে নির্ধারণ করে বাংলা সাহিত্যে এখনো পর্যন্ত কোন গবেষণা প্রকল্প গৃহীত হয়নি। সুতরাং আমরা বলতে পারি – বিষয়বস্তুভিত্তিক এই গবেষণা মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যা উপস্থাপিত করার চেষ্টা করছি তা সর্বাংশেই নতুন এবং প্রথম গবেষণা হিসেবে মর্যাদা পাবার যোগ্য।

অতঃপর, বর্তমান গবেষণার 'প্রস্তাবনা' সূচক ব্যাখ্যার পরে কিভাবে গবেষণার পরিকল্পনা করা হয়েছে তা প্রস্তাবিত ও অনুমোদিত Synopsis অনুসারে উল্লেখ করা গেল :

ভূমিকা (Proposition)- এই অংশে গবেষণার মূল লক্ষ্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় ঃ উপন্যাসে মৃত্যু, তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ বঙ্কিম - উপন্যাসে মৃত্যু।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ রবীন্দ্র উপন্যাসে মৃত্যু।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ বঙ্কিম - রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে বিধৃত মৃত্যুর তুলনামূলক আলোচনা।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ উপসংহার।

পরবর্তী আলোচনা কি ভাবে অগ্রসর হবে এই অধ্যায়-বিন্যাস থেকে তার একটা আভাস পাওয়া যাবে। বলা বাহুল্য এই প্রস্তাবনা (Proposition) অংশটি এই গবেষণাকর্মের প্রবেশিকা স্বরূপ যা পরবর্তী আলোচনার ধারাটিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রাথমিক সূত্র হিসেবেও গণ্য হতে পারে।

উল্লেখপঞ্জী ঃ

১) ড: জীবনকুমার মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের ট্র্যাজেডি চেতনা, সাহিত্যশ্রী, ১৯৭৬, পৃষ্ঠা ৮-৯

২) সুধীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য, উপন্যাসের তত্ত্ব ও বঙ্কিমচন্দ্র, জি.-এ.ই পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ৮

৩) তদৈব, পৃষ্ঠা ৮

৪) ধীরেন্দ্র দেবনাথ, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু, রবীন্দ্রভারতী, ১৯৬৬, পৃষ্ঠা ১২৩